করছি না এ বিধানটি সমস্ত ফেকাহ্‌বিদের কাছেই গ্রহণীয়। তবে হাম্বলী মযহাবের আলেমগণ এ ব্যাপারে অধিক সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

(১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপূত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বিবৃত হচ্ছে। কোন কোন ইহুদী কোন কোন মুসলমানকে বলত, আল্লাহ্‌র কসম আমরা অন্তর দ্বারা তোমাদের শুভেচ্ছা কামনা করি। তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রাপ্ত হও—আমরা মনে প্রাণে তাই আশা করি। এরূপ হলে আমরাও তা কবুল করব। কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা হিতাকাঙ্ক্ষার এই ভানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন, (মুশরিক হোক অথবা আহলে-কিতাব হোক) কাফিরদের (একটুও) মনঃপূত নয় যে, তোমরা পালন-কর্তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হও। (তাদের এ হিংসায় কিছু আসে যায় না। কারণ,) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহান অনুগ্রহদাতা।

ইহুদীদের দাবী ছিল দু'টি (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। (দুই) তারা মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রথম দাবীটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি। নিছক দাবীতে কিছু হয় না। এছাড়া দাবীটি নিরর্থকও বটে। কারণ, 'নাসিখ' (যে রহিত করে) আগমন করলে 'মনসূখ' (যাকে রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ

কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবীটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে আহ্‌লে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয় তাদেরকেও তেমনি মনে করো।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা সংঘটিত হলে ইহুদীরা তিরস্কার করতে থাকে এবং কোন কোন বিধান রহিত করার কারণে মুশরিকরাও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে শুরু করে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তিরস্কার ও আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন।) আমি কোন আয়াতের বিধান রহিত করে দিলে (যদিও কোরআনে অথবা স্মৃতিতে সে আয়াত অবশিষ্ট থাকে) অথবা (আয়াতটিকেই স্মৃতি থেকে) বিস্মৃত করিয়ে দিলে (তা কোন আপত্তির বিষয় নয়। কারণ যুক্তিসঙ্গত কারণেই তা করা হয়। সেমতে) তদপেক্ষা উত্তম আয়াত বা তার সমপর্যায়ের আয়াত (তদস্থলে আনয়ন করি। (হে আপত্তিকারিগণ,) তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান? (এমন ক্ষমতাবানের পক্ষে উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা কঠিন।) তোমরা কি জান না যে, নভোমণ্ডলে একমাত্র তাঁরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত? (এহেন বিরাট রাজত্বে যখন তাঁর কোন অংশীদার নেই, তখন উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে ভিন্ন নির্দেশ দিলে তাকে কে বাধা দিতে পারে? মোটকথা, ভিন্ন নির্দেশ দান এবং প্রস্তাব ও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিবন্ধক কেউ নেই।) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (তিনি যখন বন্ধু, তখন বিধি-বিধানে অবশ্যই উপযোগিতার

প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর তিনি যখন সাহায্যকারী, তখন বিধান পালন করার সময় শত্রুদের আগমন থেকেও তোমাদের হেফাযত করবেন। তবে বৃহত্তর পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে বাহ্যত তোমাদের উপর শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা ভিন্ন কথা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا —এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নস্‌খ' শব্দের অর্থ দূর করা, লেখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নস্‌খ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা অর্থাৎ রহিত করা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্‌খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্ত ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান বলে দেওয়াও হতে পারে।

আল্লাহ্‌র বিধানে নস্‌খের স্বরূপ ঃ জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারী করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্‌খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। (১) ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন আইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যৎ অবস্থার গতি প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারী করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্‌খ আল্লাহ্‌র আইনে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নস্‌খ' এরূপ ঃ আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না; অন্য আইন জারী করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারী করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণত রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে

লিখে দিতে পারে যে, দু'দিন এই ওষুধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতেও ভুল বোঝাবুঝির কারণে ত্রুটিরও আশংকা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহ্‌র আইনে এবং আসামানী গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নস্‌খই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানী গ্রন্থের বিধান নস্‌খ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারী করেছে। এমনি-ভাবে একই নবুয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছেঃ

لم تكن نبوة قط الا تناسخت

অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নস্‌খ ও পরিবর্তন করা হয়নি।—(কুরতুবী)

মূর্খজনোচিত আপত্তিঃ কিছুসংখ্যক মূর্খ ইহুদী অজ্ঞতাবশত খোদায়ী বিধানে নস্‌খকে সঠিক অর্থে বুঝতে পারেনি। তারা খোদায়ী নস্‌খকে জাগতিক আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার নস্‌খের অনুরূপ ধরে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভর্ৎসনার বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। এর উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে-কাসীর)

মুসলমানদের মধ্যে মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক আলেম সম্ভবত উপ-রোক্ত বিরোধীদের ভর্ৎসনা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে নস্‌খের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে—এতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, কিন্তু সমগ্র কোর-আনে বাস্তবে কোন নস্‌খ হয়নি। কোন আয়াত নাসেখও নয়, মনসূখও নয়। আবু মুসলিম ইস্পাহানীকে এই মতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। আলেম সম্প্রদায় যুগে যুগে তাঁর মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছেঃ

واتفقت اهل الشرائع على جواز النسخ و وقوعه وخالفت اليهود غير العيسوية فى جوازه وقالوا يمتنع عقلا وابو مسلم الاصفهاني فى وقوعه فقال انه وان جاز عقلا لكنه لم يقع -

(নস্‌খের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে সকল ধর্মাবলম্বীই একমত। তবে খৃস্টান সম্প্রদায় ব্যতীত সকল ইহুদী এর সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেছে। আবু মুসলিম ইস্পাহানী এর বাস্তবতা অস্বীকার করে বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে নস্‌খ সম্ভব; কিন্তু বাস্তবে কোথাও নস্‌খ হয়নি) ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেনঃ

معرفة هذا الباب اكيدة وفائدته عظيمة لا تستغنى عن معرفته العلماء ولا ينكره الا الجهلة الاغبياء۔

(নস্‌খ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা খুবই জরুরী এবং এর উপকারিতা অনেক। আলেমগণ একে উপেক্ষা করতে পারেন না। একমাত্র মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কেউ নস্‌খ অস্বীকার করতে পারে না।)

কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-র একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। একবার তিনি মসজিদে এসে এক ব্যক্তিকে ওয়াযে রত দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কি করছে? উত্তর হল, সে ওয়ায-নসীহত করছে। হযরত আলী (রা) বললেন---না, সে ওয়ায করছে না, বরং সে বলতে চায় যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক। আমাকে চিনে নাও। অতঃপর লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন ও হাদীসের নাসেখ ও মনসূখ বিধানসমূহ জান? লোকটি বলল, না, আমার জানা নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে আমাদের মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাও। ভবিষ্যতে এখানে আর ওয়ায করো না।

কোরআন ও হাদীসে নস্‌খের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি এত বেশী যে, সেগুলো উদ্ধৃত করা সহজ নয়। তফসীরে ইবনে কাসীর, ইবনে, জরীর, দুররে-মনসূর প্রভৃতি গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে—দুর্বল রেওয়ায়েতের তো গণনাই নেই।

এ কারণেই প্রশ্নটি ইজমায়ী তথা সর্বসম্মত। শুধু আবু মুসলিম ইস্পাহানী ও কতিপয় মু'তাযেলী এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তফসীরে-কবীর গ্রন্থে ইমাম রাযী পুংখানুপুংখভাবে তাদের মতামত খণ্ডন করেছেন।

নস্‌খের অর্থে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিভাষায় পার্থক্যঃ নস্‌খের পারিভাষিক অর্থ বিধান পরিবর্তন করা। এ পরিবর্তন একটি বিধানকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে তদস্থলে অন্য বিধান রাখার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন বায়তুল-মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে কেবলা বানিয়ে দেওয়া। এমনিভাবে কোন শর্তহীন ও ব্যাপক বিধানে কোন শর্ত যুক্ত করে দেওয়াও এক প্রকার পরিবর্তন। পূর্ববর্তী আলেম সম্প্রদায় নস্‌খকে এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে কোন বিধানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, আংশিক পরিবর্তন, শর্ত যুক্তকরণ অথবা ব্যতিক্রম বর্ণনা ইত্যাদি সবই নস্‌খের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই তাঁদের মতে কোরআনে মনসূখ আয়াতের সংখ্যা পাঁচশ যেখানে পরিবর্তনের পূর্বের বিধান ও পরের বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ণনা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না, পরবর্তী আলেমগণ শুধু সেখানেই নস্‌খ হয়েছে বলে মত

প্রকাশ করেন। এই অভিমত মেনে নিলে স্বভাবতই মনসূখ আয়াতের সংখ্যা বিপুল হারে হ্রাস পাবে। এরই অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আলেমদের বর্ণিত পাঁচ শ' মনসূখ আয়াতের স্থলে পরবর্তী আলেম আল্লামা সুয়ূতী মাত্র বিশটি আয়াতকে মনসূখ প্রতিপন্ন করেছেন। তারপর হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র) এগুলোর মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্ণনা করে মাত্র পাঁচটি আয়াতকে মনসূখ বলেছেন। এ প্রচেষ্টা এদিক দিয়ে সঙ্গত যে, পরিবর্তন না হওয়াই বিধানের পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই যেখানে আয়াতকে কার্যকারী রাখার পক্ষে কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, সেখানে বিনা প্রয়োজনে নসূখ স্বীকার করা ঠিক নয়।

কিন্তু এই সংখ্যা হ্রাসের অর্থ এই নয় যে, নসূখের ব্যাপারটি ইসলাম অথবা কোরআনের মধ্যে একটা ত্রুটিপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিদ্যমান ছিল—যা মোচনের চেষ্টা চৌদ্দ শ' বছর যাবত চলছে। অবশেষে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র প্রচেষ্টায় সে দোষ হ্রাস পেতে পেতে পাঁচ-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এরপরও কোন আধুনিক চিন্তাবিদের অপেক্ষা করা হচ্ছে—যিনি এসে এই পাঁচটিকেও বিলুপ্ত করে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে দেবেন।

নসূখ প্রশ্নের গবেষণায় এই পথ অবলম্বন করা ইসলাম ও কোরআনের সঠিক খেদমত নয়। এই পথ অবলম্বন করে সাহাবী, তাবেয়ী তথা চৌদ্দ শ' বছরের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) আলেমগণের রচনা ও গবেষণাকে ধুয়ে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এতে করে বিরোধীদের সমালোচনা বন্ধ হবে না। লাভের মধ্যে শুধু আধুনিক যুগের ধর্ম-দ্রোহীদের হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। তারা একথা বলার সুযোগ পাবে যে, চৌদ্দ শ' বছর যাবত আলেমরা যা বলছেন, পরিশেষে তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে —(মা'আযাল্লাহ্)। এ পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলে কোরআন ও শরীয়তের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। কারণ আজকের গবেষণা যে আগামীকাল ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে না, এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

আমি বর্তমান যুগের কোন কোন আলেমের লেখা পাঠ করেছি। তারা مَا نَنْسَخْ আয়াতটিকে متضمن معنى شرط হওয়ার কারণে قضية فرضية সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, لَوْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ এবং لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ-অতঃপর আয়াত দ্বারা তারা শুধু নসূখের সম্ভাবনা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নসূখের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন। অথচ لَوْ এবং تضمن معنى شرط قضية شرطية بحرف এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বলা বাহুল্য, এটা আবূ মুসলিম ইস্পাহানী এবং মু'তাযেলা সম্প্রদায়েরই যুক্তি।

অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর এবং সমগ্র মুসলিম সমাজের অনুবাদ দেখার পর উপরোক্ত ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নস্খের বাস্তবতা প্রমাণ করে এ সম্পর্কিত একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। (ইবনে-কাসীর, ইবনে জরীর প্রভৃতি)

এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলিম মনীষিগণের মধ্যে কেউ নস্খের বাস্তবতাকে শর্তহীনভাবে অস্বীকার করেন নি। স্বয়ং হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র) সামঞ্জস্য বর্ণনা করে সংখ্যা হ্রাস করেছেন বটে; কিন্তু নস্খের বাস্তবতাকে শর্তহীনভাবে অস্বীকার করেন নি। তাঁর পরবর্তী যমানায়ও দেওবন্দের প্রখ্যাত আলেমগণের সবাই একবাক্যে নস্খের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। তাঁদের কারও কারও সম্পূর্ণ অথবা আংশিক তফসীরও বিদ্যমান রয়েছে والله سبحانه وتعالى اعلم

أَوْ نُنْسِهَا প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী এর উৎপত্তি نِسْيَانٌ ও إِنْسَاءٌ ধাতু থেকে। উদ্দেশ্য এই যে, কখনও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত সাহাবীর মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত করিয়ে নস্খ করা হয়। এর সমর্থনে টীকাকারগণ একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে আয়াতটির উপর আমল করা না হয়, সে উদ্দেশ্যেই এরূপ বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নস্খের অবশিষ্ট বিধান উসূলে ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে।

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

---

(১০৮) ইতিপূর্বে মূসা (আ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন ইহুদী হঠকারিতাবশত হুযুর (সা)-কে বলল, মূসা (আ)-র নিকট তওরাত যেমন একযোগে নাযিল হয়েছিল, আপনিও তেমনি একযোগে কোরআন আনয়ন করুন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, হে ইহুদীগণ, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের (সমসাময়িক) রসূলের নিকট (অন্যায়) আবদার পেশ করবে যেমন ইতিপূর্বে (তোমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে) মূসা (আ)-র নিকটও আবদার করা হয়েছিল? (উদাহরণত তারা আল্লাহ্কে চাক্ষুষ দেখার আবদার করেছিল। বস্তুত সেসব আবেদনের

উদ্দেশ্য ছিল রসূল (স)-কে জব্দ করা এবং খোদায়ী বিধানের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এরূপ আচরণ নির্জলা কুফর বৈ নয়। আর) যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরের কথাবার্তা বলে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোন অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, এ কাজটি এভাবে করা হোক। বান্দার কর্তব্য হচ্ছে ঃ

زبان تازہ کردن باقرار تو - نینگیختن علت از کار تو

শায়খুল-হিন্দ (র)-এর তরজমা অনুযায়ী এ আয়াতে ইহুদীদেরকে নয়—মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যেন তারা রসূল (স)-কে অন্যায় প্রশ্নবাণে জর্জরিত না করে।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

(১০৯) আহ্লে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদের কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক, তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন ইহুদী দিবারাত্র বিভিন্ন পন্থায় বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করত। অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও তারা এ

প্রচেষ্টা থেকে বিরত হত না। আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দেন যে) আহলে-কিতাবদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) অনেকেই মনে মনে চায় যে, ঈমান আনার পর তোমাদের আবার কাফের বানিয়ে দেয়। (তাদের এ মনোবাঞ্ছা তাদের প্রদর্শিত শুভেচ্ছার কারণে নয়; বরং) শুধু প্রতিহিংসাবশত, যা (তোমাদের কোন বিষয় থেকে উদ্ভূত নয়, বরং) তাদের অন্তর থেকেই উদ্ভূত। (আর এমনও নয় যে, সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়নি, বরং) সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও (তাদের) এই অবস্থা। (এমতাবস্থায় মুসলমানদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা। তাই আল্লাহ্ বলেন,) যাক, (এখন) তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা (এ ব্যাপারে) স্বীয় নির্দেশ (বিধান) প্রেরণ না করেন। (ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তাদের হঠকারিতার প্রতিকার আমি সত্বরই নিরাপত্তামূলক বিধান অর্থাৎ হত্যা ও জিযিয়ার মাধ্যমে করব। এতে স্বীয় দুর্বলতা ও প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য দেখে এ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সংশয় দেখা দিতে পারত। তাই বলা হচ্ছে, তোমরা সংশয়াপন্ন হবে কেন?) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তোমরা (শুধু) নামায প্রতিষ্ঠিত করে যাও আর (যাদের ওপর যাকাত ফরয, তারা) যাকাত দিয়ে যাও। আর (যখন প্রতিশ্রুত আইন আসবে, তখন এসব সৎকর্মের সাথে তাও যুক্ত করে নেবে। এরূপ মনে করবে না যে, জিহাদের আদেশ না আসা পর্যন্ত শুধু নামায-রোযা দ্বারা পুণ্যকর্ম হবে না। বরং তোমরা) নিজের জন্য পূর্বে যে সৎ কর্মই সঞ্চয় করবে, আল্লাহ্র কাছে (পৌঁছে) তা (প্রতিদানসহ পুরোপুরি) পাবে। কারণ, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন (তোমাদের বিন্দু পরিমাণ আমলও নষ্ট হবে না)।

(তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদীদের প্রতিও সে আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়।)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾
بَلَىٰ ق مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ

لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ
عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

(১১১) তারা বলে, ইহুদী অথবা খৃস্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা তাদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (১১৩) ইহুদীরা বলে, খৃস্টানরা কোন পথেই নয় এবং খৃস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন পথেই নয়। অথচ সবাই খোদায়ী কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও তাদের মতই উক্তি করে। অতএব আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে নির্দেশ দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে যে, বেহেশতে কখনও কেউ যেতে পারবে না; কিন্তু যারা ইহুদী (তাদের ব্যতীত) অথবা খৃস্টান (খৃস্টানদের ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারবে না)! আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তি খণ্ডন করে বলেন, এগুলো তাদের কল্পনাবিলাস (প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়)। আপনি তাদের একথা বলে দিন, তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর। (কিন্তু তারা কস্মিনকালেও পারবে না। কারণ এর কোন প্রমাণ নেই। এখন আমি এর বিপক্ষে প্রথমে দাবী করছি যে, অন্য লোকেরাও বেহেশতে যাবে। অতঃপর এর প্রমাণ উপস্থিত করছি যে, সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীদের স্বীকৃত আমার আইন এই যে,) যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র দিকে নত করে দেয় (অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে আনুগত্য অবলম্বন করে) এবং (তৎসঙ্গে শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই নয়, আন্তরিকভাবেও) সৎকর্ম করে, সে তার আনুগত্যের প্রতিদান তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে পাবে। কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা (সে দিন) চিন্তিতও হবে না। (কারণ, ফেরেশতারা তাদের সুসংবাদ শুনিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেবেন)।

(এ যুক্তির সারমর্ম এই যে, যখন এ আইনটি সর্বজনস্বীকৃত, তখন শুধু দেখে নাও যে, আইন অনুযায়ী কারা জান্নাতে যেতে পারে? পূর্ববর্তী মনসূখ নির্দেশের ওপর আমল করাই যাদের সম্বল, তারা আনুগত্যশীল হতে পারে না। এ হিসাবে ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র অনুগত নয়। বরং পরবর্তী নির্দেশ পালন করাই হবে আনুগত্য। এ দিক দিয়ে মুসলমানরাই অনুগত। কারণ, তারা শরীয়তে-মুহাম্মদীকে কবুল করেছে। সুতরাং তারাই জান্নাতে প্রবেশকারীরূপে গণ্য হবে।

'আন্তরিকভাবে' শর্তটি যুক্ত হওয়ায় মুনাফিকরা বাদ পড়ে গেল। কারণ, শরীয়তের পরিভাষায় তারা কাফিরদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জাহান্নামের উপযুক্ত। [একবার কয়েকজন ইহুদী ও কয়েকজন খৃস্টান একত্রিত হয়ে ধর্মীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। ইহুদীরা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী খৃস্ট ধর্মকে মিথ্যা বলে এবং হযরত ঈসা (আ)-র নবুয়ত ও ইন্‌জীলকে অস্বীকার করতে থাকে। পক্ষান্তরে খৃস্টানরাও একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়ে ইহুদী ধর্মকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে এবং মূসা (আ)-র রিসালত ও তওরাতকে অস্বীকার করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘটনাটি উদ্ধৃত করে তা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছেন,] ইহুদীরা বলতে লাগল, খৃস্টানদের ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নয় (অর্থাৎ সর্বৈব মিথ্যা)। তেমনিভাবে খৃস্টানরা বলতে লাগল, ইহুদীদের ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর কায়েম নয় (অর্থাৎ সর্বৈব মিথ্যা)। অথচ তারা (উভয় পক্ষের) সবাই আসমানী গ্রন্থসমূহ পড়ে এবং পড়ায়। (অর্থাৎ ইহুদীরা তওরাত এবং খৃস্টানরা ইনজীল গ্রন্থ পড়ে এবং চর্চা করে। উভয় গ্রন্থে উভয় পয়গম্বর ও উভয় গ্রন্থের সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে। এটাই উভয় ধর্মের আসল ভিত্তি। অবশ্য মনসূখ হওয়ার ফলে বর্তমানে এতদুভয়ের একটিও পালনীয় নয়)।

(আহলে-কিতাবরা তো উপরোক্ত দাবী করতই, তাদের দেখাদেখি মুশরিকদের মনেও জোশ দেখা দিল।) তেমনিভাবে যারা নিরেট বিদ্যাহীন, তারাও আহলে-কিতাবদের মত একথাই বলতে লাগল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্ম ভিত্তিহীন, সত্যপন্থী একমাত্র আমরা)। অতএব (দুনিয়াতে প্রত্যেকেই আপন আপন কথা বলতে থাক) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে ঐসব ব্যাপারে কার্যত ফয়সালা করে দেবেন, যাতে তারা বিরোধ করত (অর্থাৎ সত্যপন্থীদের জান্নাতে এবং অসত্যপন্থীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। "কার্যত ফয়সালা" বলার কারণ এই যে, নীতিগত ফয়সালা তো বিভিন্ন যুক্তি ও হাদীস-কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়াতেও করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও খৃস্টানদের পারস্পরিক মত-বিরোধ উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর

আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে, যা পরে বর্ণিত হবে।

খৃস্টান ও ইহুদী—উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত এবং তাদের ছাড়া জগতের সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এই অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরা একথা বলার সুযোগ পেল যে, খৃস্টধর্ম ও ইহুদী ধর্ম মিথ্যা ও বানোয়াট এবং তাদের মূর্তিপূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ্ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন; তারা শুধু ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুত ইহুদী, খৃস্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্মই হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ

এক—বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর আনুগত্যকেই স্বীয় মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খৃস্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উত্তোলন করা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

দুই—যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে; কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রে আনুগত্য ও ইবাদতের সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম বিষয়টি ... بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি ... وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

আল্লাহ্‌র কাছে বংশগত ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই; গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম ঃ ইহুদী হউক অথবা খৃস্টান কিংবা মুসলমান

—যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেকে জান্নাতের ইজারাদার মনে করে নেয়; সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না। আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের ওপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে।

প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা (আ) ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা-ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইন্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা (আ) ও ইন্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কোরআনের যুগে ঐসব কার্যকলাপই সৎকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইহুদী ও খৃস্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে; তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয়; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী আর কোন সম্প্রদায়কে খৃস্টান নামে অভিহিত করেছে।

যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারিতে নিজেকে ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেওয়া হয়েছে। তেমনি-ভাবে খৃস্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। অথচ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খৃস্টানই খৃস্টান থাকতে পারে না।

কোরআন মজীদে আহ্লে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্র ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে এ কথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিস ও রেজিস্টারে আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি; সুতরাং জান্নাত এবং নবী (সা)-র মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলমান নাম লিপিবদ্ধ করলে অথবা মুসলমানের ঔরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই

প্রকৃত মুসলমান হয় না, বরং মুসলমান হওয়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়—সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খৃস্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্, রসূল, পরকাল ও কিয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোন অঙ্গীকার করেনি—যতক্ষণ না তারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রসূল (সা)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ আয়াতের সারমর্ম তাই।

আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত। অনেক অর্বাচীনের ধারণা—এ অবস্থার জন্য সম্ভবত আমাদের ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু নামটুকুই রেখেছি; আমাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই। কবির ভাষায়—وضع میں ہم ہیں نصاری تو تمدن میں ہنود (চালচলনে আমরা খৃস্টান আর সংস্কৃতিতে হিন্দু)।

এরপর ইসলাম ও মুসলমানের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য অপেক্ষা করার অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে?

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই হই ইসলামেরই নাম নিই এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূল (সা)-কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব কাফির খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের ইজারাদার। দুষ্কর্মের শাস্তি হিসাবেই যদি আজ আমরা সর্বত্র লাঞ্ছিত ও পদদলিত, তবে কাফির ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের অবসান হয়ে যায়।

প্রথমত, এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্রুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা

হয় না। মিত্রের দোষ পদে-পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শত্রুর সাথে তেমন ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেওয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়।

মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা দাবী করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত। ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণত দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়—যাতে পরকালের বোঝা হালকা হয়ে যায়। কাফিরের অবস্থা এর বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শত্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। "দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দীশালা, আর কাফিরের জন্য জান্নাত।"—মহানবী (সা)-র এ উক্তির তাৎপর্যও তাই।

মুসলমানদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফিরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণত ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর ওষুধপত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিবারাত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনিভাবে কেউ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফিরদের পার্থিব উন্নতি এবং আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয় বরং কাফিররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করছে—ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদেরই মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে-থাকত এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধনা না করত তবে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে? ইসলাম ও ঈমান সঠিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি লাভ। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী নয়।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে, তবে সেও কাফিরদের অর্জিত জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, জগতে আমাদের দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিতা, বিপদাপদ ও সঙ্কট ইসলামের কারণে নয়, বরং এগুলো একদিকে ইসলামী চরিত্র ও কর্মকাণ্ড পরিহার করার এবং অন্যদিকে ঐ সমস্ত তৎপরতা থেকে বিমুখতারই পরিণতি যদ্দ্বারা আর্থিক প্রাচুর্য অর্জিত হয়ে থাকে।

পরিতাপের বিষয়, ইউরোপীয়দের সাথে মেলামেশার সুবাদে আমরা তাদের কাছ থেকে শুধু কুফর, পরকালের প্রতি উদাসীনতা, নির্লজ্জতা, অসচ্চরিত্রতা প্রভৃতি ঠিকই শিখে নিয়েছি, কিন্তু তাদের ঐসব কর্মকাণ্ড শিক্ষা করিনি, যদ্দ্বারা তারা জগতে সাফল্য অর্জন করেছে। উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সাধনা, লেনদেনে সততা, জগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শিক্ষা ছিল, কিন্তু আমরা তাদের দেখেও তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করিনি। এমতাবস্থায় দোষ ইসলামের, না আমাদের ?

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল আশা করা যায় না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى
فِي خَرَابِهَا ۭ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۭ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾
وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۭ
إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় জালিম আর কে ? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কেবলা পরিবর্তনের সময় ইহুদীরা বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিল। এসব সন্দেহ অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করলে এর অনিবার্য পরিণতি ছিল রেসালতের অস্বীকৃতি এবং নামায বর্জন। নামায বর্জনের ফলে মসজিদ উজাড় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ইহুদীরা যেন নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে নামায বর্জন এবং মসজিদসমূহকে [বিশেষ করে মসজিদে নববীকে] জনশূন্য করার ষড়যন্ত্রেও সচেষ্ট ছিল। এছাড়া অতীতে রোম সম্রাটদের মধ্যে যেহেতু কিছু সংখ্যক ছিলেন খৃস্ট ধর্মাবলম্বী, এ জন্য সাধারণভাবে রোম সম্রাটদের কার্যকলাপের প্রতি খৃস্টানরা কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করত না। এ রোম সম্রাটরাই অতীতে একবার সিরিয়ার ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহও হয়েছিল। তখন কোন কোন অর্বাচীনের হাতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের অবমাননা ঘটে এবং এ অস্থিরতার কারণে মসজিদে নামায ও যিকর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এভাবে খৃস্টানদের পূর্বপুরুষেরা নামায বর্জন ও মসজিদ উজাড় করার পথিকৃতরূপে চিহ্নিত হয়। এই অপকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করার কারণে খৃস্টানদেরও এ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস অভিযানকারী এ সম্রাটের নাম ছিল তায়তোস। খৃস্টানরা ইহুদীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে ইহুদীদের অবমাননা নিহিত ছিল। এ কারণে খৃস্টানরা সম্রাট তায়তোসের অপকর্মের কাহিনীর নিন্দা করত না। এতদ্ব্যতীত মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করে কা'বা গৃহের তওয়াফ ও নামায আদায় করার ইচ্ছা করলেন, তখন মুশরিকরা তাঁকে বাধা দান করে। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি নামায আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এভাবে মুশরিকরাও মসজিদে হারামে (কা'বাগৃহে) ইবাদত-কারীর পথ রোধ করার কাজে সচেষ্ট হয়। এসব কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে এ কাজের দোষ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে যে আল্লাহ্র মসজিদসমূহে (মক্কার মসজিদে-হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রভৃতি সব মসজিদই এর অন্তর্ভুক্ত তাঁর নাম উচ্চারণ (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সে (মসজিদ)-গুলোকে জনশূন্য (ও পরিত্যক্ত) করতে চেষ্টা করে? তাদের পক্ষে কখনও নিঃসংকোচে (ও নির্ভীকচিত্তে) মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়। (বরং প্রবেশকালে ভয়-ভীতি, সম্মান ও শিষ্টাচার সহকারে প্রবেশ করাই বিধেয় ছিল। যখন নির্ভীকচিত্তে ভেতরে প্রবেশেরই অধিকার নেই, তখন মসজিদের অবমাননা করার অধিকার এল কোত্থেকে? একেই বলা হয়েছে জুলুম।) তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি।

(কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর ইহুদীরা প্রশ্ন তোলে যে, মুসলমানরা এদিক থেকে সেদিকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিল? আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেন) পূর্ব ও পশ্চিম---সকল দিকই আল্লাহর (তবে তা তাঁর বাসস্থান নয়)।

(সব দিকের মালিক যখন তিনিই, তখন যে দিককে ইচ্ছা কেবলারূপে নির্ধারিত করতে পারেন। কারণ ইবাদতকারীদের মনের একাগ্রতা হাসিলের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট দিককে প্রতীক হিসাবে কেবলা নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দিক থেকেই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ যে দিক সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন, সে দিকই নির্ধারিত হবে। (নাউযুবিল্লাহ্) উপাস্যের সত্তা যদি বিশেষ কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, তবে প্রয়োজনের খাতিরে সে দিককেই কেবলারূপে নির্ধারণ করা শোভন হত; কিন্তু সে পবিত্র সত্তা কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ নন। তাই, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা বিরাজমান। (কেননা,) আল্লাহ্ স্বয়ং সকল দিক ও বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন, যেরূপ বেষ্টন করা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু বেষ্টনকারী ও অসীম হওয়া সত্ত্বেও ইবাদতের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, (তিনি) সর্বজ্ঞ। (প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগিতা সম্পর্কেই তিনি জ্ঞাত। কোন বিশেষ উপযোগিতার কারণেই তিনি কেবলা নির্ধারণের এ নির্দেশ দিয়েছেন)।

বয়ানুল-কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ (১) মসজিদসমূহ জনশূন্য করার প্রয়াসী দলটি জগতে লাঞ্ছিত হয়েছে। সেসব জাতির সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা ও করদাতায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া কাফির হওয়ার কারণে পরকালে যে শাস্তি ভোগ করবে, তা সবারই জানা। মসজিদ জনশূন্য করার অপচেষ্টার দরুন পরকালে এই শাস্তির কঠোরতা আরো বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে এই তিনটি দলেরই সত্যপন্থী হওয়ার যে দাবী বর্ণিত হয়েছিল, এ ঘটনা কতক পরিমাণে সে দাবীর অসারতাও প্রমাণ করেছে যে, এহেন অপকর্ম করে সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করা নিঃসন্দেহে লজ্জাকর।

(২) কেবলা নির্দিষ্ট করার একটি রহস্য উদাহরণস্বরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে মুসলমানরা কা'বার পূজা করে বলে কোন কোন ইসলাম বিদ্বেষী যে অপবাদ রটনা করে, তা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে গেছে।

এই সারমর্ম এই যে, ইবাদত-উপাসনা আল্লাহ তা'আলারই করা হয়; কিন্তু উপাসনার সময় মনের একাগ্রতা অপরিহার্য। এ একাগ্রতার জন্য উপাসনাকারীদের একটা সমষ্টিগত 'দিক'-এর গুরুত্বও প্রচুর। এর প্রমাণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। দিকের ঐক্যের মাধ্যমে একাগ্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্যেই শরীয়তে দিক নির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপনের মোটেই অবকাশ নেই।

নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এতে যদি কেউ দাবী করে যে, আমরাও এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সামনে মূর্তি স্থাপন করে উপাসনা করে থাকি, তবে প্রথমত তাদের এ দাবীর কারণে মুসলিমদের উপর উপরোক্ত আপত্তি নতুনভাবে আরোপিত হয় না, বরং তা খণ্ডিতই থাকে। এক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও কাফিরদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে সবাই বুঝতে পারে যে, মুসলিমরা যে বিশেষ প্রতীকের পূজা আদৌ করে না এবং কাফিররা যে শুধু প্রতীকেরই পূজা করে—একথা সর্ববাদীসম্মত।

তৃতীয়ত, একধাপ নীচে নেমে বলা যায় যে, এ দাবী মেনে নিলেও এ নির্দিষ্ট-করণের পক্ষে এমন শরীয়তের নির্দেশ উপস্থিত করা প্রয়োজন, যা রহিত হয়ে যায়নি। মুসলমান ছাড়া এরূপ শরীয়ত অন্য কারও কাছে নেই।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তত্ত্ব বর্ণনায় 'প্রতীক হিসাবে' শব্দটি যোগ করার কারণ এই যে, খোদায়ী বিধি-বিধানের রহস্য সম্পূর্ণ শেষ করে ও সীমাবদ্ধ করে হৃদয়ঙ্গম করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ নির্দেশের মধ্যেও হাজারো কারণ থাকতে পারে। দু'একটি বুঝে ফেললেই তাতে সীমাবদ্ধতা এবং অন্যগুলোর অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না।

'সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান,' 'আল্লাহ্ বেষ্টনকারী এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অধিক তথ্যানুসন্ধান সমীচীন নয়। কেননা, আল্লাহ্র সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যেমন কোন বান্দার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তেমনি তাঁর সিফাতও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। মোটামুটিভাবে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা দরকার। এর চাইতে বেশীর জন্য মানুষ আদিষ্ট নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করলে খৃস্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাট তায়তোসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বাধীনে সিরিয়ার ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালায়---তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল-মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জনমানবহীন বিরানায় পরিণত করে। এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী (সা)-র আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

ফারুকে-আযম হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনর্নির্মিত হয়।

এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খৃস্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়্যুবী বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনর্দখল করেন।

তওরাতের কপিসমূহে অগ্নিসংযোগ করা, বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত ও জনশূন্য করার মত রোমীয় খৃস্টানদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই বক্তব্য কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের। হযরত ইবনে যায়েদ প্রমুখ অপরাপর ভাষ্যকার শানে নযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হোদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কায় মুশরিকরা যখন রসূল (সা)-কে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং তাঁর তওয়াফে বাধা প্রদান করে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে-জরীর প্রথম রেওয়ায়েতকে এবং ইবনে কাসীর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যাহোক, ভাষ্যকারদের মতে আয়াতের শানে নযুল উপরোক্ত দু'টি ঘটনার মধ্য থেকেই কোন একটি হবে। কিন্তু বর্ণনায় সাধারণ শব্দের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র আইনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে---যাতে নির্দেশটিকে বিশেষ করে এসব খৃস্টান ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা না হয়; বরং বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা হয়। এ কারণেই আয়াতে বিশেষভাবে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নামোল্লেখের পরিবর্তে 'আল্লাহ্র মসজিদসমূহ' বলে সব মসজিদের ক্ষেত্রেই নির্দেশটিকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। এসব আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কোন মসজিদে যিকর করতে বাধা দেয় অথবা এমন কোন কাজ করে, যার দরুন মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে, সে সবচাইতে বড় জালিম।

মসজিদসমূহের মাহাত্ম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে ভয়, সম্মান, বিনয় ও নম্রতা-সহকারে প্রবেশ করা কর্তব্য---যেমন, কোন প্রতাবশালী সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করার সময় করা হয়।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-নববীর অবমাননা যেমন বড় জুলুম,

তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব একলক্ষ রাকাআতের নামাযের সমান এবং মসজিদে-নববী ও বায়তুল-মোকাদ্দাসের পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তর থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেওয়ার যত পন্থা হতে পারে, সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামায, তসবীহ্, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তিলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকহ্-বিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর অথবা তিলাওয়াত করায় দোষ নেই।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামায, তসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত, মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে, সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামাযীর সংখ্যা হ্রাস পায়। কেননা, প্রাচীর ও কারুকার্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় না; বরং তা আবাদ হয় আল্লাহ্র যিকরকারী মুসল্লীদের দ্বারা। তাই কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۝

অর্থাৎ---প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় ঐসব লোক দ্বারা, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন---কিয়ামত নিকটবর্তী হলে মুসলমানদের মসজিদসমূহ বাহ্যত আবাদ, কারুকার্যখচিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হবে জনশূন্য। এসব মসজিদে নামাযীর উপস্থিতি হ্রাস পাবে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন---ভদ্রতা ও মানবতার কাজ ছয়টি। তিনটি মুকীম বা স্বগৃহে বসবাসকালীন ও তিনটি মুসাফির বা সফরকালীন। স্বগৃহে বসবাসকালীন তিনটি হচ্ছে এই—(১) কোরআন তিলাওয়াত করা, (২) মসজিদসমূহ আবাদ করা এবং (৩) বন্ধু-বান্ধবের এমন সংগঠন তৈরী করা, যারা আল্লাহ্ ও দ্বীনের কাজে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে সফরকালীন তিনটি হচ্ছে এই—(১) আপন পাথেয় থেকে দরিদ্র সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করা, (২) সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করা, এবং (৩) সফর-সঙ্গীদের সাথে হাসিখুশী, আমোদ-প্রমোদ ও প্রফুল্লচিত্ত হওয়া। তবে আমোদ-প্রমোদে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা শর্ত।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উক্তিতে মসজিদ আবাদ করার অর্থ, সেখানে বিনয় নম্রতা সহকারে উপস্থিত হওয়া এবং যিকর ও তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকা। পক্ষান্তরে মসজিদ জনশূন্য হওয়া অর্থ হচ্ছে সেখানে নামাযী না থাকা কিংবা কমে যাওয়া অথবা এমন কারণের সমাবেশ ঘটা, যদ্দ্বারা বিনয় ও নম্রতা বিঘ্নিত হয়।

যদি হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ ও মুশরিকদের বাধা প্রদান আয়াতের শানে নযুল হয়, তবে এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ মসজিদকে বিধ্বস্ত করাই নয়, বরং যে উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মিত হয় অর্থাৎ নামায ও আল্লাহ্র যিকর, সে উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে কিংবা কম হলেও মসজিদকে জনশূন্য বলা হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা আপনাকে মক্কা ও বায়তুল্লাহ্ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, মদীনায় পৌঁছার পর প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত আপনাকে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি এবং এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। পূর্ব-পশ্চিম তাঁর কাছে সমান। নামাযের কেবলা কা'বা হোক কিংবা বায়তুল-মোকাদ্দাস হোক—এতে কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন উভয় জায়গায়ই সওয়াবের কারণ।

কাজেই যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, তখন তাতেই সওয়াব ছিল এবং যখন কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন এতেই সওয়াব। আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না। বান্দা নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্‌র মনোযোগ উভয় অবস্থাতেই সমান।

কয়েক মাসের জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়ে কার্যক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, কোন বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা সাব্যস্ত করার কারণ এই নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ পাক সেই স্থান অথবা দিকের মধ্যেই রয়েছেন, অন্যত্র নেই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র, এবং সবদিক সমান মনোযোগ সহকারে তিনি বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এ বিষয়টি নিজের বাণীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কোন বিশেষ দিককে সারা বিশ্বের কেবলা সাব্যস্ত করার পেছনে অন্যান্য রহস্য ও উপযোগিতাও থাকতে পারে। কারণ আল্লাহ্‌র মনোযোগ যখন কোন বিশেষ দিক অথবা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তখন নামায পড়ার ব্যাপারে দুই পন্থাই অবলম্বন করা সম্ভব। প্রথমত, প্রত্যেককেই যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করে নামায পড়ার স্বাধীনতা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, সবার জন্য বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করে দেওয়া। প্রথমাবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল দৃশ্য সামনে ভেসে উঠবে। দশজন একত্রে নামায পড়লে প্রত্যেকের মুখ থাকবে পৃথক পৃথক দিকে এবং প্রত্যেকের কেবলা হবে পৃথক পৃথক। দ্বিতীয় অবস্থায় শৃঙ্খলা ও একতার বাস্তব চিত্র ফুটে উটবে। এসব রহস্যের কারণে সারা বিশ্বের কেবলা এক হওয়াই বান্ছনীয়। এখন তা বায়তুল-মোকাদ্দাস হোক অথবা কা'বাগৃহে, উভয় স্থানই পবিত্র ও পুণ্যময়। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের উপযুক্ত বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা রাখা হয়েছে! এরপর হুযুর আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামের ইচ্ছা অনুযায়ী এ নির্দেশ রহিত করে কা'বাকে সারা বিশ্বের কেবলা স্থির করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ -

অর্থাৎ, আমি লক্ষ্য করছি, কা'বাকে কেবলা বানিয়ে দেওয়ার আন্তরিক বাসনার কারণে আপনি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকেন যে, হয়তো ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন। এ কারণে আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব, যা আপনি কামনা করেন। এখন থেকে আপনি নামাযে

থেকেই স্বীয় মুখ মসজিদে-হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন। এ নির্দেশ বিশেষভাবে শুধু আপনার জন্যই নয়, বরং সমগ্র উম্মতকেও দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যেখানেই থাক, এমনকি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অভ্যন্তরে থাকলেও নামাযে মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নেবে।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণ-স্বরূপ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়-তুল-মোকাদ্দাসের পূজা করা নয় কিংবা এ দু'টি স্থানের সাথে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেওয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এর পরও বিভিন্ন রহস্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত হুযুরে আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে কার্যত বলে দেওয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামায-সমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাস্সির فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাযেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের যদি দিক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেই অবস্থাতেই নামায পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধ-কারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে।

নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে—পুনরায় পড়তে হবে না।

আয়াতের এই বর্ণনায় হুযুর (সা)-এর আমল এবং উল্লিখিত খুঁটি-নাটি মাসআলা দ্বারা কেবলামুখী হওয়া সম্পর্কিত শরীয়তের নির্দেশটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

(১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র ; বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন।

(১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কোন কোন ইহুদী হযরত উযাইর (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র বলে দাবী করত। এছাড়া আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে 'আল্লাহ্র কন্যা' বলে অভিহিত করত। বিভিন্ন আয়াতে ওদের এসব উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব উক্তির ত্রুটি ও অসারতা বর্ণনা করেছেন।] তারা (বিভিন্ন শিরোনামে) বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। সোবহানাল্লাহ! (কি বাজে কথা!) বরং (তাঁর সন্তান ধারণ যুক্তির দিক দিয়েও সম্ভবপর নয়। কারণ আল্লাহ্র সন্তান হয় ভিন্ন জাতি হবে, না হয় সমজাতি হবে। যদি ভিন্ন জাতি হয় তবে ভিন্ন জাতি সন্তান হওয়া একটি ত্রুটি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত। যুক্তির দিক দিয়ে এটা স্বীকৃত এবং কোরআন-হাদীসের দিক দিয়েও প্রমাণিত। যেমন, سبحانه শব্দের মাধ্যমে তাই বোঝা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সন্তান যদি সমজাতির হয়, তবে তা বাতিল হওয়ার এক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন সমজাতি নেই। কারণ, পূর্ণত্বের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ, সে সবই আল্লাহ্র সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত—অন্যের মধ্যে তা নেই। কাজেই অন্যের পক্ষে আল্লাহ্

হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং, আল্লাহ্‌র সন্তান সমজাতি হওয়াও বাতিল। পূর্ণত্বের যাবতীয় সিফাত যে আল্লাহ্‌র সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, এখানে তারই প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। প্রথমত, (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, সবই বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। দ্বিতীয়ত, মালিকানাধীন হওয়ার সাথে সাথে) সবাই তাঁর আজ্ঞাধীনও বটে। (এই অর্থে যে, শরীয়তের বিধিবিধান কেউ কেউ এড়াতে পারলেও জীবন ও মৃত্যু প্রভৃতির বিধান কেউ এড়াতে পারে না। তৃতীয়ত, তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একক স্রষ্টা। চতুর্থত, তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাও এমন বিরাট ও অভাবনীয় যে) যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তখন (মাত্র) তাকে একথাই বলেন, 'হয়ে যা' (অতঃপর) তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কারিগর কিংবা কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। এই চারটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে নেই। যারা আল্লাহ্‌র সন্তান আছে বলে দাবী করে, তাদের কাছেও একথা স্বীকৃত। সুতরাং প্রমাণ সব দিক দিয়েই পূর্ণ হয়ে গেল)।

জ্ঞাতব্য ঃ (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা— যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিযিক পৌঁছানো ইত্যাদি কোন-না-কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনটিই এজন্য নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

(২) ইমাম বায়যাভী বলেন, পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌কে 'পিতা' বলা হত। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থ বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

(১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা প্রত্যয়শীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন কোন মূর্খ [ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতায়] বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ্ আমাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়া) কেন কথা বলেন না (যেমন, নিজে ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন, এই কথাবার্তায় হয় নিজেই আমাদের বিধি-বিধান বলে দিবেন—যাতে একজন রসূলের প্রয়োজন না থাকে, না হয় অন্তত এতটুকু বলে দেবেন যে, মুহাম্মদ আমার রসূল। এরূপ হলে আমরা তাঁর রিসালত মেনে নিয়ে তাঁরই আনুগত্য করব)। অথবা (কথা না বললে) আমাদের কাছে (রিসালত প্রমাণের অন্য) কোন নিদর্শন কেন আসে না? (আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে একে মূর্খতাসুলভ রীতি বলে আখ্যা দিচ্ছেন যে,) এমনিভাবে তাদের পূর্ব যারা ছিল, তারাও তাদের অনুরূপ (মূর্খতাসুলভ) কথা বলেছে। (সুতরাং বোঝা গেল যে, এই উক্তি কোনরূপ গভীরতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়; এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই উক্তির কারণ বর্ণনা করেছেন যে,) তাদের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূর্খদের) অন্তর (বোকামিতে) একই রকম। (এ কারণেই সবার মুখ থেকে একই রকম কথা বের হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তির জওয়াব দিচ্ছেন। তাদের উক্তির প্রথম অংশ ছিল নিরেট বোকামিপ্রসূত। কারণ তারা আপনাকে ফেরেশতা ও পয়গম্বরদের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন বলতে প্রয়াস পেয়েছিল, যা একেবারেই অলীক। এ কারণেই এই অংশকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অংশের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা এক নিদর্শনের কথা বলছ; অথচ) আমি (রিসালত প্রমাণের বহু) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, কিন্তু তা তাদের জন্য (উপকারী ও যথেষ্ট), যারা বিশ্বাস করে। (কিন্তু আপত্তিকারীদের উদ্দেশ্য হল হঠকারিতা। এ কারণে সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে তারা প্রকৃত সত্যের খোঁজ নিতে চায় না। সুতরাং এমন লোকদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব কে নেবে)?

(ইহুদী ও খৃস্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন)।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۙ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

(১১৯) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী-রূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(রসূলুল্লাহ্ [সা] ছিলেন 'রাহ্মাতুল্লিল-আলামীন'—সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত। তাই কাফিরদের মূর্খতা, শত্রুতা ও কুফরের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখে তিনি বিষণ্ণ ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে বলেন, হে রসূল!) নিশ্চয় আপনাকে সত্য ধর্মসহ (সৃষ্ট জীবের প্রতি) পাঠিয়েছি, যাতে আপনি (অনুগতদের) সুসংবাদ শোনাতে থাকেন ও (অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির) ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। (দোযখবাসীদের সম্পর্কে) আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (যে, ওরা সত্যধর্ম কবুল না করে কেন দোযখে গেল? আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, কেউ মানল কি মানল না, সে চিন্তা আপনার করা উচিত নয়)।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۭ قُلْ
اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاۗءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

(১২০) ইহুদী ও খৃস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ্ প্রদর্শন করেন, তা-ই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কখনও সন্তুষ্ট হবে না আপনার প্রতি ইহুদী ও খৃস্টানরা; যে পর্যন্ত না আপনি ওদের ধর্মের (সম্পূর্ণ) অনুসারী হয়ে যান। (অথচ তা অসম্ভব। সুতরাং ওদের সন্তুষ্ট হওয়াও অসম্ভব। যদি এ ধরনের কথা তাদের মুখ থেকে অথবা অবস্থা-দৃষ্টে প্রকাশ পায়, তবে) আপনি (পরিষ্কার ভাষায়) বলে দিন, (ভাই) আল্লাহ্ (হেদায়েতের জন্য) যে পথ প্রদর্শন করেন, (বাস্তবে) সেটিই (হেদায়েতের) সরল পথ। (বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামই সে পথ; সুতরাং ইসলামই হল হেদায়েতের পথ।) আপনার কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছার পর, যদি আপনি তাদের সে সমস্ত (ভ্রান্ত) ধারণাসমূহের অনুসরণ করেন, (যেগুলোকে তারা ধর্ম মনে করে; কিন্তু বিকৃত ও কিছু রহিত হওয়ার ফলে এখন তা শুধু ভ্রান্ত

ধারণার সমষ্টি হয়ে রয়েছে,) তবে (এমতাবস্থায়) আল্লাহ্র কবল থেকে আপনাকে উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী কেউ নেই। (বরং এজন্য আল্লাহ্র ক্রোধানলে পতিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্ অনন্তকাল আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, একথা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং ক্রোধ অসম্ভব। উপরিউক্ত অনুসরণের ফলে এই অসম্ভাব্যতা অনিবার্য হয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষে অনুসরণও অসম্ভব। অনুসরণ ব্যতীত তাদের সন্তুষ্টিও সম্ভবপর নয়। সুতরাং এর আশা করাও বৃথা। কাজেই মন থেকে তা মুছে ফেলা দরকার।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

(১২১) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে-কিতাব শত্রুদের উল্লেখ এবং বিরোধীদের ঈমানের ব্যাপারে পূর্ণ নৈরাশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছিল। এরপর কোরআনের রীতি অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণ আহলে-কিতাবদের বর্ণনা আসছে, যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর হুযুর (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসরণ করছে। আল্লাহ্ বলেন,) আমি যাদেরকে (তওরাত ও ইঞ্জীল) গ্রন্থ (এই শর্তে) দান করেছি, (যে,) তারা তা যথার্থভাবে তিলাওয়াত করে (অর্থাৎ বোধশক্তিকে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার কাজে নিয়োগ করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সত্যের অনুসরণে ব্যবহার করে,) তারাই তৎপ্রতি (অর্থাৎ আপনার সত্যধর্ম ও ওহীর জ্ঞানের প্রতি) ঈমান আনে (ও বিশ্বাস স্থাপন করে)। আর যারা অবিশ্বাস করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানের ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবে)।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য-প্রাপ্ত হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সেসব বিষয়বস্তুর প্রাথমিক ভূমিকা পুনর্বার বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পূর্বোল্লিখিত বিষয়বস্তুগুলো ছিল এই ভূমিকারই পূর্ণ বিবরণ। পুনর্বার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য, আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ ও বিশেষ অনুগ্রহগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে কেয়ামতকে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করা। ভূমিকার বিশেষ বিষয়বস্তু বারবার উল্লেখের উদ্দেশ্য যেন তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কেননা মোটামুটি কথাটিই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সাধারণ বাক-পদ্ধতিতেও এ নিয়মকেই উৎকৃষ্ট মনে করা হয়। দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করার পূর্বে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শিরোনামে মোটামুটি কথাটি ব্যক্ত করা হয় যাতে পরবর্তী পূর্ণ বিবরণ বোঝার পক্ষে এই শিরোনামটি যথেষ্ট সহায়ক হয়। উপসংহারে সারমর্ম হিসাবে সংক্ষিপ্ত শিরোনামটি পুনরুল্লেখ করা হয়। উদাহরণত যেমন বলা হয় অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস; এতে এক ক্ষতি এই, দ্বিতীয় ক্ষতি এই, তৃতীয় ক্ষতি এই। দশ-বিশটি ক্ষতি বর্ণনা করার পর উপসংহারে বলে দেওয়া হয়, মোটকথা, অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস। এই নিয়ম অনুযায়ীই আয়াতে "ইয়া বনী ইসরাঈল"-এর পুনরুল্লেখ হয়েছে।)

হে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানবর্গ! তোমরা আমার ঐসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি বিভিন্ন সময়ে তোমাদেরকে দান করেছি এবং (আরও স্মরণ কর যে,) আমি (অনেক মানুষের উপর অনেক বিষয়ে) তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তোমরা ঐ দিনকে (অর্থাৎ কেয়ামত দিবসকে) ভয় কর যেদিন কোন ব্যক্তি কারও পক্ষ থেকে কোন দাবী আদায় করতে পারবে না এবং কারও পক্ষ থেকে (পাওনার পরিবর্তে) কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না কিংবা (ঈমান না থাকলে) কারও কোন সুপারিশও ফলপ্রদ হবে না এবং কেউ তাদের (বলপূর্বক) বাঁচাতে পারবে না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা (স্বীয় বিধি-বিধানের) কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তা পুরোপুরি পালন করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা (তাকে) বললেন, আমি তোমাকে (এর প্রতিদানে নবুয়ত দিয়ে অথবা উম্মত বাড়িয়ে) মানব জাতির নেতা করব। তিনি নিবেদন করলেন, আমার বংশধরের মধ্য থেকেও কোন কোনজনকে (নবুয়ত দিন)। উত্তর হল, (তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল; কিন্তু এর রীতিনীতি শুনে নাও) আমার (এই নবুয়তের) অঙ্গীকার আইন অমান্যকারীদের পর্যন্ত পৌঁছুবে না। (সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য 'না'-ই হল পরিষ্কার জওয়াব। তবে অনুগতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নবুয়ত-প্রাপ্ত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য, পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ্ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতি বলে দেওয়া হল। এতে হযরত খলীলুল্লাহ্র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষভাবে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত, যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে?

তৃতীয়ত, কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থত, কি পুরস্কার দেওয়া হল?

পঞ্চমত, পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথমত, পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কোরআনের একটি শব্দ رَبُّ (তাঁর পালনকর্তা) এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। আর তাঁর 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের (পালনকর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা হিসাবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আ)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে—এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু كَلِمَاتٌ (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী-দের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

আল্লাহ্র কাছে শিক্ষা বিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশি ঃ পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশি, তা শিক্ষা বিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়, বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেওয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পারিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন ঃ

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

অর্থাৎ আমি হুকুম দিয়ে দিলাম, হে অগ্নি, ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের অগ্নি সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুত কোন বিশেষ স্থানের অগ্নিকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই অগ্নি ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের অগ্নিও এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল!

কোরআনে بَرْدًا (শীতল) শব্দের সাথে سَلَامًا (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سلاما বলা না হলে অগ্নি বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় সগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন।

انکس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند
فرزند وعیال وخانماں را چہ کند

অর্থ—যে ব্যক্তি তোমাকে চিনেছে সে তার জীবন, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন দিয়ে কি করবে?

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। —(ইবনে কাসীর)

জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্যশ্যামল বনানী এলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাঈল (আ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই—গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কা নগরী সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হল। আল্লাহ্র বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হল না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) নির্দেশ পেলেন, 'বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানেই রেখে সিরিয়ায় ফিরে যাও।' আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবিক আমি চলে যাচ্ছি'—বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকন্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন?' হযরত ইবরাহীম নির্বিকার রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলীলুল্লাহ্রই সহধর্মিণী! ব্যাপার বুঝে ফেললেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন?' হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, 'হাঁ!' খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশী মনে বললেন, 'যান। যিনি আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।'

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোঁজে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বারবার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাতবার ছুটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড় দু'টির মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজ্জের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল (আ) এলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমান এই ঝর্ণাধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জন্তু-জানোয়ারেরা এল। জন্তু-জানোয়ার দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হয়ে গেল।

হযরত ইসমাঈল (আ) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখুলি নির্দেশ পেলেন : 'এ ছেলেকে আপন হাতে জবাই কর।' কোরআনে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝

"বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন : হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরয করলেন : পিতঃ, আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ্ আমাকেও আপনি এ ব্যাপারে সুদৃঢ় পাবেন ॥"

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে পুত্রকে জবাই করাটাই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেন নি; বরং জবাই করছেন অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) সেটাই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত থেকে এর পরিপূরক আয়াত নাযিল করে কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল শক্ত ও বড় কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহ্‌কে

করা হল। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ ও বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিতরত' (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত। ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে; হযরত ইবরাহীম (আ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকু-সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী—এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মু'মিনূনে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۝

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে; কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালংঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

সূরা আহ্যাবে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যকারী পুরুষ ও আনুগত্যকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিণী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিণী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী নারী, অধিক

পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিণী নারী—তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মাগফিরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

কোরআনের মুফাস্‌সির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত كلمات যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্য থেকে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হল।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে ঃ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষার সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন। এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে—বলা হয়েছে ঃ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا —পরীক্ষার পর আল্লাহ্ বলেন—আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্ব দান করব।

এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আ)-কে সাফল্যের প্রতিদানে মানব সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা জাগতিক পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। জাগতিক পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ-কেই সাফল্যের স্তর বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কোরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

"যখন তারা শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হল এবং আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী হল, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"

এই আয়াতে صبر (সংযম) ও يقين (বিশ্বাস) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। صبر হল শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يقين কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালিমকে নেতৃত্ব লাভের সম্মান দেওয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্ব লাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব একদিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধি। আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا
مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।

শব্দার্থ : مَثَابَةً শব্দটি ثَابَ يَثُوبُ ثَوْبًا وَمَثَابًا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। এ কারণে مثابة শব্দের অর্থ হবে প্রত্যাবর্তনস্থল—যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য উপাসনাস্থল ও (সর্বদা) শান্তির আবাসস্থল হিসাবে পরিণত করে রেখেছি। (পরিশেষে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছি যে, বরকত লাভের জন্য) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে

নামাযের জায়গা বানাও। আমি কা'বা নির্মাণের সময় (হযরত) ইবরাহীম ও (হযরত) ইসমাঈল (আ)-এর কাছে আদেশ পাঠিয়েছি যে, আমার (এই) গৃহকে বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের (ইবাদতের) জন্য এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য খুব পাক (সাফ) রাখ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহ্‌র মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা ঃ এই আয়াতে কা'বাগৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। এতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। সূরা হজ্জের ২৬তম আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ - وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ০

অর্থাৎ "ঐ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বাগৃহের স্থান নির্দেশ করে দিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আমার গৃহকে তওয়াফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দেবে। তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং শ্রান্তক্লান্ত উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে আসবে।"

তফসীরে ইবনে-কাসীরে খ্যাতনামা মুফাসসির হযরত মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈলসহ সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পান যে, আপনাকে কা'বা গৃহের স্থান নির্দেশ করা হবে। আপনি সে স্থানকে পাক-সাফ করে তওয়াফ ও নামায দ্বারা আবাদ রাখবেন। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল বোরাক নিয়ে আগমন করলেন এবং ইবরাহীম ইসমাঈল ও হাজেরাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দৃষ্টিগোচর হলেই হযরত ইবরাহীম জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করতেন, আমাদের কি এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

হযরত জিবরাঈল (আ) বলতেন ঃ না, আপনার গন্তব্যস্থান আরও সামনে। অবশেষে মক্কার স্থানটি সামনে এল। এখানে কাঁটাযুক্ত বন-জঙ্গল ও বাবলা বৃক্ষ ছাড়া কিছুই ছিল না। এ ভূ-খণ্ডের আশেপাশে কিছু জনবসতি ছিল ; তাদের বলা হত 'আমালীক'। আল্লাহ্র গৃহটি তখন টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ) জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের কি এখানেই বসবাস করতে হবে ? জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ হাঁ।

হযরত ইবরাহীম (আ) শিশু-পুত্র ও স্ত্রী হাজেরাসহ এখানে অবতরণ করলেন। কা'বাগৃহের অদূরেই একটি ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করে ইসমাঈল ও হাজেরাকে সেখানে রেখে দিলেন। খাদ্যপাত্রে কিছু খেজুর এবং মশকে পানিও রাখলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি সেখানে থাকার নির্দেশ ছিল না। তাই দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননীকে আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। তাঁকে প্রস্থানোদ্যত দেখে হাজেরা বললেন, এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? এখানে না আছে খাদ্য-পানীয়, না আছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

হযরত খলীলুল্লাহ্ কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হাজেরা পেছন থেকে বারবার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু কোন উত্তর নেই। অবশেষে হাজেরা নিজেই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন কি ? এবার হযরত ইবরাহীম (আ) মুখ খুললেন। বললেন, হাঁ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এ নির্দেশ।

এ কথা শুনে হাজেরা বললেন ঃ তবে আপনি স্বচ্ছন্দে যান। যিনি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও ধ্বংস করবেন না। ইবরাহীম (আ) চলতে লাগলেন ; কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের কথা বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগল। যখন রাস্তার এমন এক মোড়ে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখান থেকে হাজেরা তাঁকে দেখতে পান না, তখন দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন। দোয়াটি সূরা ইবরাহীমের ৩৬ ও ৩৭তম আয়াতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

"হে পালনকর্তা! এ শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ।" এরপর দোয়ায় বললেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ

وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ○

—"পরওয়ারদেগার! আমি আমার সন্তানকে আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটবর্তী একটি চাষাবাদের অযোগ্য প্রান্তরে আবাদ করেছি, পরওয়ারদেগার, যাতে তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে। আপনি কিছু মানুষের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে কিছু ফলের দ্বারা উপজীবিকা দান করুন, যাতে কৃতজ্ঞ হয়।"

যে নির্দেশের ভিত্তিতে ইসমাঈল ও তাঁর জননীকে সিরিয়া থেকে এখানে আনা হয় তাতে বলা হয়েছিল যে, আমার গৃহকে পাক-সাফ রাখবে। হযরত ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, পাক রাখার অর্থ বাহ্যিক ময়লা ও আবর্জনা থেকে পাক রাখাও বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যে দোয়া করেন, তাতে প্রথমে বস্তিকে নিরাপদ ও শান্তিময় করার কথা বলে পরে বললেন, "আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" কেননা হযরত খলীলুল্লাহ্ মা'আরেফতের এমন স্তরে উপনীত ছিলেন, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিলুপ্ত দেখতে পায়, নিজের ক্রিয়াকর্ম ও ইচ্ছাকে আল্লাহ্র করায়ত্ত এবং তাঁরই ইচ্ছায় সব কাজকর্ম সম্পন্ন হয় বলে অনুভব করে। কাজেই তিনি কুফর ও শিরক থেকে আল্লাহ্র ঘরকে পাক রাখার নির্দেশের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দোয়ায় কুফর ও শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। তা এই যে, কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ থেকে ভবিষ্যতে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং কা'বাগৃহকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়ে শিরকে লিপ্ত হতে পারত। এ কারণেই দোয়া করলেন যে, শিরক থেকে আমাদের দূরে রাখুন।

অতঃপর দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে দোয়া করলেন যে, আপনার নির্দেশ মোতাবিক আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে আমি তাদের আবাদ করেছি। কিন্তু স্থানটি চাষাবাদের যোগ্যও নয় যে, কেউ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেও তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। তাই আপনিই কৃপা করে তাদেরকে ফল দ্বারা রিযিক দান করুন।

এই দোয়ার পর হযরত খলীলুল্লাহ্ সিরিয়ায় চলে গেলেন। এদিকে খেজুর ও পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে হাজেরা ও তাঁর পুত্র উভয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। এরপর পানির জন্য বের হওয়া, কখনও সাফা পাহাড়ে—কখনও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা, উভয় পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়ানো—যাতে ইসমাঈল দৃষ্টির অন্তরালে না পড়ে—ইত্যাকার ঘটনা সাধারণ মুসলমানের অজানা নেই। হজ্জ পালন করতে গিয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো সে ঘটনারই স্মৃতিচারণ।

কাহিনীর শেষভাগে আল্লাহ্র আদেশে জিবরাঈল (আ)-এর সেখানে পৌঁছা, যমযম প্রবাহিত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করে জুরহাম গোত্রের জনৈকা রমণীর সাথে হযরত

ইসমাঈলের বিয়ে প্রভৃতি ঘটনা সহীহ্ বুখারী শরীফে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত একত্রিত করলে জানা যায় যে, সূরা হজ্জের প্রথম ভাগের আয়াতে কা'বাগৃহকে আবাদ করা ও পাক-সাফ রাখার নির্দেশ দ্বারা সে স্থানকে হযরত ইসমাঈল ও হাজেরা দ্বারা আবাদ করাই উদ্দেশ্য ছিল। সে নির্দেশ শুধু হযরত ইবরাহীমকে লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছিল। কেননা, ইসমাঈল ছিলেন তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। তখন কা'বা পুনর্নির্মাণের নির্দেশ ছিল না। কিন্তু সূরা বাক্কারার আলোচ্য আয়াতে وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ হযরত ইবরাহীমের সঙ্গে ইসমাঈলকেও যোগ করা হয়েছে। কারণ এ নির্দেশটি তখনকার, যখন হযরত ইসমাঈল যুবক ও বিবাহিত।

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছেঃ একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) স্ত্রী ও পুত্রকে দেখার উদ্দেশ্যে মক্কা আগমন করলে ইসমাঈলকে একটি গাছের নিচে বসে তীর বানাতে দেখতে পান। পিতাকে দেখে পুত্র সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর হযরত ইবরাহীম (আ) বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর যে ঢিবির নিচে কা'বাগৃহ অবস্থিত ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ) সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেনঃ আমি এর নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের চতুর্সীমা বলে দিয়েছিলেন। পিতাপুত্র উভয়ে মিলে কাজ আরম্ভ করলে কা'বাগৃহের প্রাচীন ভিত্তি বেরিয়ে পড়ল। এ ভিত্তির উপরই তারা নির্মাণ কাজ আরম্ভ করলেন। পরবর্তী আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাতা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) আর হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী।

কোন কোন হাদীসে এবং ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, কা'বাগৃহ পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকেও এ সত্যই প্রতিভাত হয়। কেননা, আয়াতসমূহে কোথাও কা'বাগৃহের স্থান নির্দেশ করার কথা এবং কোথাও পাক-সাফ রাখার কথা আছে। কিন্তু একটি নতুন গৃহ নির্মাণের কথা কোথাও নেই। কাজেই বোঝা যায় যে, এ ঘটনার পূর্ব থেকেই কা'বাগৃহ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর নূহের আমলে সংঘটিত মহাপ্লাবনের সময় হতে তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, না হয় ভিত্তিটুকু ঠিক রেখে বাকীটুকু উঠিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কা'বাগৃহের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন; বরং তাঁদের হাতে প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনর্নির্মিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কা'বাগৃহ প্রথমে কখন কে নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত নেই। আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টানদের রেওয়ায়েত

থেকে জানা যায় যে, হযরত আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতারা এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এরপর আদম (আ) এর পুনর্নির্মাণ করেন। নূহের মহা-প্লাবন পর্যন্ত এ নির্মাণ অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল পর্যন্ত তা একটি টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর এর প্রাচীরে বহু ভাঙা-গড়া হয়েছে কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি। মহানবী (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কুরায়েশরা একে বিধ্বস্ত করে নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণকাজে হযরত (সা) নিজেও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

হেরেম সম্পর্কিত বিধিবিধান

১. مَثَابَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাগৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানব জাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ لا يقضى احد منها وطرا অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'বাগৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই যিয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোন কোন আলেমের মতে কা'বাগৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ হয়, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে।

এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বাগৃহেরই বৈশিষ্ট্য। নতুবা জগতের শ্রেষ্ঠ-তম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই হয় না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা ; তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছানোর জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

২. এখানে اَمْنًا শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ, শান্তির আবাসস্থল بيت শব্দের অর্থ শুধু কা'বাগৃহ নয় ; বরং সম্পূর্ণ হেরেম। অর্থাৎ কা'বাগৃহের পবিত্র প্রাঙ্গণ। কোরআনে بيت الله ও كعبة শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হেরেমকে বোঝানো হয়েছে,

তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كعبة বলে সমগ্র হেরেমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরবানী কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমি কা'বার হেরেমকে শান্তির আলয় করেছি। শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যক্রম থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

—(ইবনে-আরাবী)

আইয়্যামে-জাহিলিয়তে আরবদের হাতে ইবরাহীমী ধর্মের যে শেষ চিহ্নটুকু অবশিষ্ট ছিল, তারই ফলে হেরেমে পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে পেয়েও কেউ প্রতিশোধ নিত না। তারা হেরেমে সাধারণ যুদ্ধ-বিগ্রহও হারাম মনে করত। এ বিধানটি ইসলামী শরীয়তেও হুবহু বাকী রাখা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হেরেমে যুদ্ধ করা কয়েক ঘন্টার জন্য বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ভাষণে বিষয়টি ঘোষণা করে দেন।—(সহীহ্ বুখারী)

যদি কেউ হেরেমের অভ্যন্তরেই এমন অপরাধ করে বসে, ইসলামী আইনে যার সাজা হদ ও কিসাস (মৃত্যুদণ্ড, হত্যার বিনিময়ে মৃত্যু বা অর্থদণ্ড)-এর শাস্তি হয়, তবে হেরেম তাকে আশ্রয় দেবে না, বরং হদ ও কিসাস জারি করতে হবে। এটাই ইজমা তথা সর্বসম্মত রায়।—(আহকামুল কোরআন—জাসসাস, কুরতুবী) কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ অর্থাৎ, 'তারা যদি হেরেমে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর।'

এখানে একটি মাস'আলার ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি হেরেমের বাইরে অপরাধ করে হেরেমে আশ্রয় নেয়, তবে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? কোন কোন ইমামের মতে হেরেমের মধ্যেই তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, সে সাজার কবল থেকে রেহাই পাবে না। কারণ, তাকে রেহাই দেওয়া হলে অপরাধের সাজা থেকে বাঁচার একটি পথ খুলে যাবে। ফলে পৃথিবীতে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং হেরেম শরীফ অপরাধী-দের আখড়ায় পরিণত হবে। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে হেরেমের ভিতরে সাজা দেওয়া হবে না, বরং হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করতে হবে। বের হওয়ার পর সাজা দেওয়া হবে।

৩. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى এখানে মাকামে-ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মো'জেযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। —(সহীহ্ বুখারী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যিয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মাকামে-ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, সমগ্র হেরেমটিই মাকামে-ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকআত নামায মাকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হেরেমের যে কোন অংশে পড়লেই নির্দেশটি পালিত হবে। অধিকাংশ ফিক্হশাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

৪. আলোচ্য আয়াতে মাকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বাগৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى অতঃপর মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মাকামে-ইবরাহীম। —(সহীহ্ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ যদি কেউ মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা'বা—উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

৫. আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফের পরবর্তী দুই রাকআত নামায ওয়াজিব।—(জাসসাস, মোল্লা আলী ক্বারী)

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হেরেমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'রাকআত নামায কা'বাগৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে (জাসসাস)। মোল্লা আলী ক্বারী 'মানাসেক' গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকআত মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে

পড়া সুন্নত। যাদ কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিদায় হজ্বে হযরত উম্মে সালমা (রা) এমনি বিপাকে পড়েন, তখন তিনি মসজিদে-হারামে নয়, বরং মক্কা থেকে বের হয়ে দু'রাক'আত ওয়াজিব নামায পড়েন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। প্রয়োজনবশত হরমের বাইরে এ নামায পড়লে ফিক্হবিদদের মতে কোন কোরবানীও ওয়াজিব হয় না। একমাত্র ইমাম মালেকের মতে কোরবানী ওয়াজিব হয়। —(মানাসেক, মোল্লা আলী কারী)

৬. طَهِّرْ بَيْتِيَ এখানে কা'বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা—উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বাগৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بَيْتِيَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সব মসজিদই আল্লাহর ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ

হযরত ফারূকে আযম (রা) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন ঃ 'তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ জান না?' (কুরতুবী) অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত; এতে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বাগৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং উম্মাদদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকে।

৭. لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমত, কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ, ই'তেকাফ ও নামায। দ্বিতীয়ত, তওয়াফ আগে আর নামায পরে (হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী

হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থত, ফরয হোক অথবা নফল— কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে যে কোন নামায পড়া বৈধ।—(জাস্‌সাস)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ قَالَ
وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۭ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۭ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

(১২৬) স্মরন কর, যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন ঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বল-প্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো ; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করছিল ঃ পরওয়ার-দেগার! আমাদের এ কাজ কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (১২৮) পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) (দোয়া প্রসঙ্গে) বললেন, পরওয়ারদেগার, এ (স্থান)-কে তুমি (আবাদ) শহর কর, (শহরও কেমন) শান্তিধাম কর, এর অধিবাসীদের রিযিক দান কর ফলমূলের মাধ্যমে, (আমি সব অধিবাসীর কথা বলি না; বিশেষ করে তাদের কথা বলি,) যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে। (অবশিষ্টদের ব্যাপার আপনিই জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন, (আমার রিযিক বিশেষভাবে দেওয়ার রীতি নেই। এ কারণে ফলমূল সবাইকে দেব--- মু'মিনকেও এবং) যারা অবিশ্বাস করে, (তাদেরকেও। তবে পরকালে মু'মিনরাই বিশেষ-ভাবে মুক্তি পাবে। তাই যারা কাফির) তাদের কিছুদিন (অর্থাৎ ইহকালে) প্রচুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেব। অতঃপর (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) তাদের বল-প্রয়োগের মাধ্যমে দোযখের আযাবে পৌঁছে দেব। (পৌঁছার) এ জায়গাটি খুবই নিকৃষ্ট। (সে সময়টিও স্মরণ-যোগ্য) যখন উত্তোলন করছিল ইবরাহীম (আ) কা'বাঘরের প্রাচীর (তার সঙ্গে) ইসমাঈলও। (তারা বলছিল,) পরওয়ারদেগার! আমাদের এ শ্রম কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণ-কারী, সর্বজ্ঞ (আমাদের দোয়া শোন এবং আমাদের নিয়ত জান) পরওয়ারদেগার! (আমরা উভয়ে আরও দোয়া করি) আমাদের উভয়কে তোমার আরও আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধরের মধ্যেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর; আমাদের হজ্ব (ইত্যাদির) বিধি-বিধান বলে দাও এবং আমাদের অবস্থার প্রতি সদয় মনোযোগ দাও। (প্রকৃতপক্ষে) তুমিই মনোযোগদাতা, দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) আল্লাহ্র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া ঃ ইবরাহীম (আ) رَبِّ শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ, 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম

দোয়া এই ঃ "তোমার নির্দেশ আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে ফেলে রেখেছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও—যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।" এ দোয়াটিই সূরা ইবরাহীমে هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাতে الف ও لام সহ البلد উল্লিখিত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণে একে معرفة বলা হয়। পার্থক্যের কারণ সম্ভবত এই যে, সূরা বাক্কারার এই প্রথম দোয়াটি তখন করা হয়, যখন স্থানটি একান্তই জনমানবহীন প্রান্তর ছিল। আর দ্বিতীয় দোয়াটি বাহ্যত তখন করা হয়, যখন মক্কায় বসতি স্থাপিত হয়ে স্থানটি একটি নগরীতে পরিণত হয়েছিল। এর সমর্থনসূচক ইঙ্গিত সূরা ইবরাহীমের শেষভাগে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ

—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বার্ধক্য সত্ত্বেও আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক—এ দু'টি সন্তান দান করেছেন।" এতে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় দোয়াটি হযরত ইসহাকের জন্মের পরবর্তী সময়ের। হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈলের তের বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে, পরওয়ারদেগার! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফিরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলেও পরিণত হয়েছে। বিশ্বের চারদিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রু-সম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কোরআনে উল্লিখিত রয়েছে। তারা কা'বাঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহিলিয়ত যুগে আরবরা অগণিত অনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বাঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত

না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ্ তা'আলা হরমের চতুঃসীমার জন্তু-জানোয়ারকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তা-বোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হরমের শান্তিস্থল হওয়ার এসব বিধান (যা ইবরাহীম [আ]-এর দোয়ারই ফলশ্রুতি) জাহিলিয়ত যুগ থেকেই কার্যকরী রয়েছে। ইসলাম ও কোরআন এগুলোকে অধিকতর সুসংহত ও বিকশিত করেছে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও করামেতা শাসকবর্গের হাতে হরমে অত্যাচার-উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, কোন কাফির জাতি আক্রমণ করেনি। কেউ নিজ হাতে নিজের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে তা শান্তির পরিপন্থী নয়। এছাড়া এগুলো একান্তই বিরল ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছরের মধ্যে কয়েকটি গুনাগুনতি ঘটনা। হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ভয়াবহ পরিণতিও সবার সামনে ফুটে উঠেছে।

মোটকথা, হযরত ইবরাহীমের দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা শহরটিকে প্রাকৃতিক দিক দিয়েও সারা বিশ্বের জন্য শান্তির আলয়ে পরিণত করে দিয়েছেন। এমনকি দাজ্জালও হরমে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া শরীয়তের পক্ষ থেকে এ বিধানও জারি করা হয়েছে যে, হরমে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা, জন্তু-জানোয়ার শিকার করা পর্যন্ত হারাম।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসাবে যেন ফলমূল দান করা হয়। মক্কা মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে এ মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে দিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে তা মক্কার বাজারেই বেচাকেনা হয়। কোন অসমর্থিত রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তায়েফ ছিল সিরিয়ার একটি ভূখণ্ড। আল্লাহ্র নির্দেশে জিবরাঈল (আ) তায়েফকে এখানে স্থানান্তরিত করে দিয়েছেন।

দোয়ার রহস্য ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর দোয়ায় একথা বলেন নি যে, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ফলোদ্যান অথবা চাষাবাদযোগ্য করে দাও। বরং তাঁর দোয়া ছিল এই যে, ফলমূল উৎপন্ন হবে অন্যত্র, কিন্তু পৌঁছাবে মক্কায়। এর

রহস্য সম্ভবত এই যে, হযরত ইবরাহীমের সন্তানরা চাষাবাদ অথবা বাগানের কাজে মশগুল হয়ে পড়ুক, এটা তাঁর কাম্য ছিল না। কারণ, তাদের এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যই ছিল হযরত ইবরাহীমের ভাষায় رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ এতে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর সন্তানদের প্রধান বৃত্তি কা'বাঘরের সংরক্ষণ ও নামাযকে সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। নতুবা স্বয়ং মক্কা মুকাররমাকে এমন সুশোভিত ফলোদ্যানে পরিণত করা মোটেই কঠিন ছিল না---যার প্রতি দামেস্ক এবং বৈরুতও ঈর্ষা করত।

জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ফলেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ ثمرات শব্দটি ثمرة -এর বহুবচন। এর অর্থ ফল। বাহ্যত এর দ্বারা গাছের ফল বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সূরা কাসাসের ৫৭তম আয়াতে এ দোয়া কবুল হওয়ার কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ يُجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (মক্কায় সবকিছুর ফল আনা হবে) এখানে প্রথমত, বলা হয়েছে যে, স্বয়ং মক্কায় ফল উৎপন্ন করার ওয়াদা নয়; বরং অন্য স্থান থেকে এখানে আনা হবে। يُجْبٰى শব্দের অর্থ তাই। দ্বিতীয়ত, ثمرات كل شجر (প্রত্যেক গাছের ফল) বলা হয়নি। এ শাব্দিক পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফলকে ব্যাপক অর্থে বোঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ সাধারণ প্রচলিত ভাষায় ثمر প্রত্যেক বস্তু থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে বোঝায়। গাছ থেকে উৎপন্ন ফল যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মেশিন থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীও মেশিনের ফল। বিভিন্ন হাতের তৈরী আসবাবপত্রও হস্তশিল্পের ফল। এভাবে ثمرات كل شيء -এর মধ্যে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্রই ফলের অন্তর্ভুক্ত। অবস্থা এবং ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হরমের পবিত্র ভূমিকে চাষাবাদ ও শিল্পোৎপাদনের যোগ্য না করলেও সারা বিশ্বে উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পসামগ্রী এখানে সহজলভ্য করে দিয়েছেন। সম্ভবত আজও কোন বৃহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প শহরে এমন সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নেই, যাতে সারা বিশ্বের উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী মক্কার মত প্রচুর পরিমাণে ও সহজে লাভ করা যায়।

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর সাবধানতা ঃ আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরের মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মু'মিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালিম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া; হযরত খলীল (আ) ছিলেন আল্লাহ্র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও আল্লাহ্-ভীতির

প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মু'মিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফির ও মুশরিক হয়। তবে মু'মিনদেরকে ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফিররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে ফেলে রাখেন এবং কা'বাগৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্র এমন এক বন্ধু, যিনি আল্লাহ্র প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্র উপযুক্ত ইবাদত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বাগৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ—এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতির ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমাদের আজ্ঞাবহ কর। কারণ, মা'আরেফাত তথা আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে তত বেশী অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا—এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেমিক, আল্লাহ্র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন! কিন্তু এই ভালবাসার দাবীসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা

করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন ঃ 'আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর। সন্তানদের জন্য এ দোয়ার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্যমান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। (বাহ্‌রে মুহীত)

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনও সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহিলিয়ত আমলের আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার ছিল, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল।---(বাহ্‌রে মুহীত)

مَنَاسِكَ — مَنَاسِكُ — أَرِنَا مَنَاسِكَنَا-এর বহুবচন। হজ্জের ক্রিয়াকর্মকে مَنَاسِكُ বলা হয় এবং আরাফাত, মিনা, মুযদালেফা ইত্যাদি হজ্জের স্থানকেও 'মানাসিক' বলা হয়। এখানে শব্দটি উভয় অর্থেই হতে পারে। দোয়ার সারমর্ম এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং হজ্জের স্থানসমূহ আমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দাও। أَرِنَا শব্দের অর্থ 'দেখিয়ে দাও' দেখা চোখ দ্বারাও হতে পারে, অন্তর দ্বারাও। দোয়ার মর্মানুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে হজ্জের স্থানসমূহ দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন—যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশীল হেকমতওয়ালা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমাদের পালনকর্তা! (আরও প্রার্থনা এই যে, আমার বংশধরের মধ্য থেকে যে দলের জন্য দোয়া করছি) তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন পয়গম্বর নিযুক্ত করুন---যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে (খোদায়ী) গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সুবুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে (এ শিক্ষা ও তিলাওয়াত দ্বারা মূর্খজনোচিত চিন্তাধারা ও কাজকর্ম থেকে) পবিত্র করবেন, নিশ্চয়ই আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

শব্দার্থ বিশ্লেষণ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ —তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায় না।'

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ —এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্র কিতাব বোঝানো হয়েছে। 'হেকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। (কামূস)

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন, এ শব্দটি আল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। শায়খুল -হিন্দ (র)-এর অনুবাদে এর অনুবাদ করা হয়েছে نکی باتیں অর্থাৎ গূঢ়তত্ত্ব। এ অনুবাদে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 'হেকমত' শব্দটি আরবী ভাষায় একাধিক অর্থে বলা হয়। 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' 'সৎকর্ম', 'ন্যায়', 'সুবিচার,' 'সত্য কথা' ইত্যাদি। (কামূস ও রাগেব)

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তফসীরকার সাহাবীগণ হুযুরে আকরাম (সা)-এর কাছ থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে 'হেকমত' শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ্। ইবনে কাসীরও ইবনে জরীর কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে

গভীর জ্ঞান অর্জন, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এ সব উক্তির সারমর্ম হল রসূল (সা)-এর সুন্নাহ।

وَيُزَكِّيهِمْ — زَكَاةٌ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ভবিষ্যৎ বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন ---যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমত, এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্য গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়ত, এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ, সগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার আশংকা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, 'প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং আকাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে।' (ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য ঃ 'মসনদে আহ্মদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলেন, 'আমি আল্লাহ্র কাছে তখনও পয়গম্বর ছিলাম, যখন আদম (আ)-ও পয়দা হন নি; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি ঃ 'আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া, ঈসা (আ)-র সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। ঈসা (আ)-র সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (আমি এমন এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহ্মদ)। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কোরআনে হুযুর (সা)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যে পয়গম্বরের জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি ঃ সূরা বাক্কারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে-ইমরান ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযুর (সা) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী (সা)-র জগতে পদার্পণ ও তাঁর রিসালতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, কোরআন তিলাওয়াত, দ্বিতীয়ত, আসমানী গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়ত, মানুষের চরিত্র শুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তিলাওয়াত ঃ এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তিলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তিলাওয়াত ও হেফাযত একটি ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী (সা)-র প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগ্মী এবং কবিও ছিলেন। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করাই বাহ্যত তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল---পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন অপরাপর গ্রন্থের মত নয়---যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন না হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন এমন নয়। কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি শব্দসম্ভারও উদ্দেশ্য। কোরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফিকহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে هو النظم و المعنى جميعا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দসম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কোরআন। এতে বোঝা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাযে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে কোরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। হাদীসে কোরআন তিলাওয়াতের যে সওয়াব বর্ণিত রয়েছে, তা পরিবর্তিত শব্দের কোরআন পাঠে অর্জিত হবে না। এ কারণেই ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষার এ জাতীয়

অনুবাদ 'উর্দু কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজী কোরআন' বলে দেওয়া হয়। কারণ, ভাষান্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

মোটকথা, আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতকে কোরআন শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে একটি উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি উদ্দেশ্য। কেননা, তিলাওয়াত করা হয় শব্দের----অর্থের নয়। অতএব, অর্থ শিক্ষা দেওয়া যেমন পয়গম্বরের কর্তব্য, তেমনি শব্দের তিলাওয়াত এবং সংরক্ষণও তাঁর একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, কোরআন অবতরণের আসল লক্ষ্য তাঁর প্রদর্শিত জীবন-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, তাঁর শিক্ষাকে বোঝানো। সুতরাং শুধু শব্দ উচ্চারণ করেই তুষ্ট হয়ে বসে থাকা কোরআনের বাস্তব রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাঁর অবমাননারই নামান্তর।

অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়—সওয়াবের কাজ ঃ কিন্তু এতদসঙ্গে একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতা পাখীর মত শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ এই দুয়েরই সমন্বিত আসমানী গ্রন্থের নাম কোরআন। কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চস্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তিলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও সওয়াবের কাজ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বোঝা ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। বোঝা এবং আমল করার জন্য একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোরআন তিলাওয়াতকে 'অঙ্কের যষ্ঠি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোরআনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তিলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্যধারাই প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তিলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের ইবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাতত কোরআনের অর্থ বুঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার

জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কোরআনের সত্যিকার নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। (মা'আযাল্লাহ্) কোরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে বের হয়।

মোটকথা, আয়াতে রসূলের কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন তিলাওয়াতকে স্বতন্ত্র কর্তব্যের মর্যাদা দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, কোরআনের শব্দ তিলাওয়াত, শব্দের সংরক্ষণ এবং যে ভঙ্গিতে তা অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভঙ্গিতে তা পাঠ করা একটি স্বতন্ত্র ফরয। এমনিভাবে এ কর্তব্যটির সাথে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু আরবী ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং রসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী এর শিক্ষা লাভ করাও অপরিহার্য। সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গ্রন্থের ভাষা জানা বা সে ভাষায় পারদর্শী হওয়াই যথেষ্ট নয়—যে পর্যন্ত শাস্ত্রটি কোন সুদক্ষ ওস্তাদের কাছ থেকে অর্জন করা না হয়। উদাহরণত আজকাল হোমিও-প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদি সাধারণত, ইংরেজীতে লেখা। কিন্তু সবাই জানে যে, শুধু ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদি পাঠ করেই কেউ ডাক্তার হতে পারে না। প্রকৌশল বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে কেউ প্রকৌশলী হতে পারে না। বড় বড় শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ দৈনন্দিন কর্ম-পদ্ধতিও শুধু পুস্তক পাঠ করে, ওস্তাদের কাছে না শিখে কেউ অর্জন করতে পারে না। আজকাল, প্রতিটি শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে শত শত পুস্তক লিখিত হয়েছে, চিত্রের সাহায্যে কাজ শেখার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এসব পুস্তক দেখে কেউ কোনদিন দর্জি, বাবুর্চি অথবা কর্মকার হতে পেরেছে কি? যদি শাস্ত্র অর্জন ও শাস্ত্রের পুস্তক বোঝার জন্য ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট হত, তবে যে ব্যক্তি সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষা জানে, সে জগতে সব শাস্ত্র অর্জন করতে পারত। এখন প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখতে পারে যে, সাধারণ শাস্ত্র বোঝার জন্য যখন ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়, ওস্তাদের প্রয়োজন, তখন কোরআনের বিষয়বস্তু যাতে ধর্মবিদ্যা থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি সবই রয়েছে—শুধু ভাষাজ্ঞান দ্বারাই কেমন করে তা অর্জিত হতে পারে? তাই যদি হতো, তবে যে আরবী ভাষা শেখে, তাকেই কোরআন তত্ত্ববিশারদ মনে করা হত। আজও আরব দেশসমূহে হাজার হাজার ইহুদী খৃস্টান আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক রয়েছেন। তাঁরাও বড় বড় তফসীরবিদ বলে গণ্য হতেন এবং নবুয়তের যুগে আবু লাহাব ও আবু জহলকে কোরআন বিশারদ মনে করা হত।

মোটকথা, কোরআন একদিকে রসূল (সা)-এর কর্তব্যকর্মের মধ্যে আয়াত তিলাওয়াতকে স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে এবং অন্যদিকে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক

কর্তব্য সাব্যস্ত করে বলে দিয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু তিলাওয়াত শুনে নেওয়াই আরবী ভাষাবিদের পক্ষেও যথেষ্ট নয়; বরং রসূলের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই কোরআনী শিক্ষা সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। কোরআনকে রসূলের শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে নিজে বোঝার চিন্তা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। কোরআনের বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রসূল প্রেরণেরও প্রয়োজন ছিল না; আল্লাহ্‌র গ্রন্থ অন্য কোন উপায়েও মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তিনি জানেন, জগতের অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় কোরআনের বিষয়বস্তু শেখানো ও বোঝানোর জন্য ওস্তাদের প্রয়োজন অধিক। এ ব্যাপারে সাধারণ ওস্তাদও যথেষ্ট নন; বরং এসব বিষয়বস্তুর ওস্তাদ এমন ব্যক্তিই হতে পারেন, যিনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলার গৌরবে গৌরবান্বিত। ইসলামের পরিভাষায় তাঁকেই বলা হয় নবী ও রসূল। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জগতে প্রেরণের উদ্দেশ্য কোরআনে এরূপ সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তিনি কোরআনের অর্থ ও বিধি-বিধান সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে ঃ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ, আপনাকে প্রেরণের লক্ষ্য এই যে, আপনি মানুষের সামনে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন। তাঁর কর্তব্য-সমূহের মধ্যে কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সাথে হেকমত শিক্ষাদানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আরবী ভাষায় যদিও হেকমতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, কিন্তু এ আয়াতে এবং এর সমার্থক অন্যান্য আয়াতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ 'হেকমতের' তফসীর করেছেন রসূলের সুন্নাহ্। এতে বোঝা গেল যে, কোর-আনের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্ব, তেমনি সুন্নাহ্ নামে খ্যাত পয়গম্বরসুলভ প্রশিক্ষণের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অন্যতম কর্তব্য। এ কারণেই মহানবী (সা) বলেছেন: انما بعثت معلما (আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি)। অতএব, শিক্ষক হওয়াই যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তখন তাঁর উম্মতের পক্ষেও ছাত্র হওয়া অপরিহার্য। এ কারণে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার উচিত তাঁর শিক্ষাসমূহের আগ্রহী ছাত্র হওয়া। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহস ও সময়ের অভাব হলে যতটুকু দরকার, ততটুকু অর্জনেই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ ঃ মহানবী (সা)-র তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিত্র করা। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, দুনিয়া-প্রীতি ইত্যাদি। কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র

পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সূফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা ঃ আল্লাহ্র গ্রন্থ ও রসূল ঃ এ প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্যে দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি শুধু রসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হন নি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাটাই যথেষ্ট নয়, বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুস্থ ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতি পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানা স্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

—"হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।"
অন্যত্র সত্যবাদীদের সংজ্ঞা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

—"তারাই সত্যবাদী এবং তারাই পরহেযগার।"

সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার সারমর্ম হল সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে

কোরআনের পথ, রসূলের পথ অথবা সুন্নাহ্‌র পথ বলার পরিবর্তে কিছু আল্লাহ্-ভক্তের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে ঃ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ—"সিরাতে-মুস্তাকীম হল তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ।"

অন্য এক জায়গায় নেয়ামত প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۝

—এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও পরবর্তীকালের জন্য কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

يا ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى اهل بيتى -

—"হে মানব জাতি, আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر অর্থাৎ—আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে— عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين অর্থাৎ—আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা থেকে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ্-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন

থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশী।

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কিনা, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খৃস্টানদের রোগ। কোরআন বলে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ—"তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।" এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে ঃ আল্লাহ্র কিতাব কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

এ কারণে উপরোক্ত দু'টি অবলম্বনকে যথাস্থানে বজায় রেখে তা থেকে উপকার লাভ করা দরকার। মনে করতে হবে যে, আসল নির্দেশ একমাত্র আল্লাহ্র; প্রকৃত আনুগত্য তাঁরই, আমল করা ও করানোর জন্য রসূল হচ্ছেন একটি উপায়। রসূলের আনুগত্য এদিক দিয়েই করা হয় যে, তা হবহু আল্লাহ্র আনুগত্য। এছাড়া কোরআন ও হাদীস বোঝা ও আমল করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের উক্তি ও কর্ম থেকে সাহায্য নেওয়াকে সৌভাগ্য ও মুক্তির কারণ মনে করা কর্তব্য। উল্লিখিত আয়াতে কিতাবের শিক্ষাদানকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করায় আরও একটি বিষয় বোঝা যায়। তা হলো এই যে, কোরআনকে বোঝার জন্য যখন রসূলের শিক্ষাদান অপরিহার্য এবং এছাড়া যখন সঠিকভাবে কোরআনের উপর আমল করা অসম্ভব, তখন কোরআন ও কোরআনের যেরযবর যেমন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত, তেমনি রসূলের শিক্ষাও সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। নতুবা শুধু কোরআন সংরক্ষিত থাকলেই কোরআন অবতরণের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। রসূলের শিক্ষা বলতে সুন্নাহ্ ও হাদীসকে বোঝায়। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হাদীস সংরক্ষণের ওয়াদা কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদার মত জোরদার নয়। কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে—

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ০ অর্থাৎ—"আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।"

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহ্‌র ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ্ এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লিখিত আয়াতদৃষ্টে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ্ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারাও অব্যাহত থাকবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার উম্মতে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, যাঁরা কোরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্য রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কোরআনের বাস্তবায়ন কিয়ামত পর্যন্ত ফরয। কাজেই রসূলের শিক্ষাও কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত রসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে-কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক ঃ পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীন কার্যত প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হল প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুযুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। সাহস না করলে সবকিছু জানা ও বোঝার পরও অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ ঃ

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد
پر طبیعت ادھر نہیں آتی -

(আনুগত্য ও পরহেযগারীর সওয়াব জানি ; কিন্তু কি করব, মন যে এ পথে আসে না।)

আমলের সাহস ও শক্তি গ্রন্থ পাঠে অর্জিত হয় না। এর একটিমাত্র পথ আল্লাহ্